সংবাদ সম্মেলন, ভাষণ, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া
স্থান : বিএনপি চেয়ারপার্সন কার্যালয়, গুলশান, ঢাকা
তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩, মঙ্গলবার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম।
ভয়ংকর রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস কবলিত দেশ। প্রতিদিন রক্ত ঝরছে। বিনাবিচারে নাগরিকদের জীবন কেড়ে নেয়া হচ্ছে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে নিভৃত পল্লীতেও ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। সকলের চোখে অনিশ্চয়তার ছায়া। নির্বিকার শুধু সরকার। তাদের লক্ষ্য একটাই, যে-কোনো মূল্যে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখা। তাই তারা ভিনদেশী হানাদারদের মতো 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন করে চলেছে। এমন পরিস্থিতি আমরা কখনো চাইনি। এই দেশের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আছে। এ দেশের জনগণের প্রতি আমাদের মমতা আছে। তাই আমরা বরাবর সমঝোতার কথা বলেছি। শুধু মুখে বলা নয়, আমরা সমঝোতার জন্য সব রকমের চেষ্টা করছি। সকল দলের অংশগ্রহনে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। সে প্রস্তাব আমাদের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টেও পেশ করা হয়েছে। আমরা বলেছি, আসুন, এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে একটা ঐক্যমতে পৌঁছাই। সরকার তাতেও রাজি হয়নি। তারা অনড় অবস্থান নিলেন। ক্ষমতায় থেকে, পার্লামেন্ট বহাল রেখেই তারা নির্বাচন করবেন। আমরা চাইলে তাদের সরকারে কয়েকজন মন্ত্রী দিতে পারবো শুধু। এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে একটি দল কীÑধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, তা আজ দেশবাসীর সামনে পরিস্কার। আমরা একটা সমঝোতার উদ্যোগ নেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকেও অনুরোধ জানিয়েছিলাম। রাষ্ট্রপতির পক্ষে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে দেশবাসী এর মাধ্যমে সমঝোতার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ ও আন্তরিকতার প্রমাণ পেয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বিশেষ দূত অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো এসে

সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলের বৈঠকের উদ্যোগ নেন। আমরা তাতেও সাড়া দিয়েছি। যদিও মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটক আমাদের নেতা-কর্মীদের মুক্তি দেয়া হয়নি। বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। এমনকি, একতরফা নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়নি। অর্থাৎ, আলোচনার একট সুষ্ঠু পরিবেশ সরকারের তরফ থেকে সৃষ্টি করা হয়নি। তা সত্ত্বেও আলোচনার মাধ্যমে সংকট সুরাহা করার ব্যাপারে আন্তরিকতার সর্বোচ্চ প্রমাণ আমরা দিয়েছি। দু:খের বিষয়, তিন দফা আলোচনা সত্ত্বেও সরকারের অনড় মনোভাবের কারণে কোনো সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হয়নি। তারা সকল দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়নি। ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনের নামে কী-ধরণের প্রহসন করা তাদের উদ্দেশ্য, তা সকলের সামনে এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। আসলে কেবল লোক দেখানোর জন্য তারা আলোচনায় এসেছিলেন। এটা ছিল সময় ক্ষেপণে তাদের এক প্রতারণাপূর্ণ কৌশল। এর আড়ালে তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথেই এগিয়ে গেছে। আপনারা জানেন, তৃতীয় দফা বৈঠকে আমাদের দেয়া প্রস্তাব নিয়ে সরকারী দল তাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে আবার ফিরে আসার অঙ্গীকার করেছিল। তারা সে কথাও রাখেনি। আমাদেরকে আর কিছু জানানোও হয়নি। সংবাদ-মাধ্যম থেকে আমরা জেনেছি যে, তারা বলেছে, দশম সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনার আর কোনো অবকাশ নেই। নির্বাচনের নামে একতরফা এক নজীরবিহীন প্রহসনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,
সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রশ্নে ১৯৯৫-৯৬ সালে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিকে সঙ্গী করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে আন্দোলনের নামে দেশজুড়ে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল আওয়ামী লীগ। হত্যাকান্ড, ধ্বংসযজ্ঞ ও অর্থনৈতিক বিনাশই ছিল তাদের আন্দোলনের পন্থা। গান পাউডার দিয়ে যানবাহন জ্বালিয়ে তারা নিরপরাধ নাগরিকদের হত্যা করেছে। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর তারা দীর্ঘদিন অচল করে রেখেছে। সে সময় বিএনপি সরকার দেশ

পরিচালনা করছিল। আমরা বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়ে সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলাম। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বন্ধুরাও মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের অনমনীয়তা ও সন্ত্রাস-আশ্রয়ী কার্যকলাপের কারণে কোনো উদ্যোগই সফল হয়নি। আমরা প্রথম দিকে তাদের দাবির সঙ্গে একমত ছিলাম না। কিন্তু সকলের অংশগ্রহনে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে আমরা তাদের দাবি পূরণে সম্মত হই। তবে তার আগেই আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের সব সদস্য জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। তখন সংবিধান সংশোধন করার মতো দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিএনপি'র ছিলনা। তাই কেবলমাত্র সংবিধান সংশোধনের জন্য পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে একটি স্বল্পমেয়াদী জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য আমরা নতুন নির্বাচন দিই। আমরা ঘোষনা করি, এটি একটি নিয়ম-রক্ষার নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে জিতলে আমরা দেশ পরিচালনা করবো না। আমরা সে কথা রেখেছিলাম। সংবিধান সংশোধন করে জাতীয় নির্বাচনকালীন তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর আমরা সংসদ ভেঙ্গে দিই এবং সরকার পদত্যাগ করে। সেই তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে, ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করার হীন উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ একতরফাভাবে সংবিধানের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করেছে। সে কারণেই আজকের সংকটের সূত্রপাত ঘটেছে। এই হঠকারিতার কারণে দেশে যা-কিছু ঘটছে, তার দায়-দায়িত্ব আওয়ামী লীগের নেতাদেরকেই বহন করতে হবে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, দুই প্রধান রাজনৈতিক পক্ষের মধ্যে একটি ঐক্যমত ও সমঝোতা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সকলের অংশগ্রহনে একটি সুষ্ঠ, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। এটা জানা সত্বেও, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে, প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে, তাদের ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করার যে কূটকৌশল গ্রহন করেছে, তার বিষময় কুফল আজ দেশবাসী পাচ্ছে।

সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,
আওয়ামী লীগের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই বলে থাকেন যে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি জনগণের ভোটের অধিকার

নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু সংবিধানের এই বিতর্কিত সংশোধনীর আওতায় তিনি আজ নির্বাচনের নামে যে প্রহসন পরিচালনা করছেন তাতে জনগণের ভোট ছাড়াই ১৫৪ জন এমপি হয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য তাদের জনগণের ভোটের কোনো প্রয়োজন হয়নি। দেশের মোট ভোটারের শতকরা প্রায় ৫৩ জনের ভোটের অধিকার এই প্রক্রিয়ায় কেড়ে নেয়া হয়েছে। বাকী আসনগুলোতেও যারা প্রার্থী আছেন তাদেরও কোনো উপযুক্ত ও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সেখানেও ভোটাররা বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে। কারণ শুধু বিএনপি নয়, দেশের উল্লেখযোগ্য সকল বিরোধী দলই এই নির্বাচনী প্রহসন বর্জন করেছে। শুধু আওয়ামী লীগ এবং তাদের জোটের একাংশ এই একতরফা প্রহসনে শামিল হয়েছে। এই নির্বাচনী তামাশা কোনো ইলেকশন নয়, এটা নির্লজ্জ সিলেকশন। জনগণের ভোটাধিকার হরণের এমন জঘণ্য প্রহসন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক ঘৃণ্য কলঙ্কের অধ্যায় হয়ে থাকবে। শাসকদলের এই অপকৌশলের কথা আমরা বিগত কয়েক বছর ধরেই বারবার বলে আসছিলাম। দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই চরম অত্যাচারী ও অযোগ্য সরকার জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কোনো নির্বাচনে জনগণের ভোটে নিজেদের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সাহস তাদের নেই। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের জন্য আমাদের দাবি গণদাবি ও জাতীয় আকাঙ্খায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জনমত জরিপে দেখা গেছে শতকরা ৮০ জনেরও বেশি মানুষ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন করার পক্ষে। যখন সারাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের সঙ্গে রাজপথে নেমে শান্তিপূর্ণভাবে এই দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষনা করছিলেন, তখন সরকার শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সকল অধিকার কেড়ে নিয়েছে। দুনিয়ার সব গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের ও বিরোধী দলের রাজপথে নেমে শান্তিপূর্ণ পন্থায় তাদের দাবি তুলে ধরার অধিকার থাকলেও বাংলাদেশে তা নেই। এখানে কেবল সরকারের সমর্থকরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ছত্রছায়ায় রাজপথে সশস্ত্র মহড়া দিতে পারে। অথচ আমাদের সংবিধানে সকলকেই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠানের

অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দিয়ে কারাগারগুলো ভরে ফেলা হয়েছে। আমাদের সদর দফতর ও শাখা কার্যালয়গুলো অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। নির্বিচারে চলছে হত্যা, গুম, নির্যাতন, গুলি, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ, গ্রেফতার ও অপহরণ। সুপরিকল্পিতভাবে এই সন্ত্রাসী পরিবেশ তৈরি করে দেশের জনগণ ও বিরোধী দলকে আতংকিত ও পলায়নপর রেখে সরকার তাদের নির্বাচনী প্রহসনের নীল-নক্শার বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

প্রিয় বন্ধুরা,
এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুটি গুরুতর কথা বলেছেন।
এক. সমঝোতার মাধ্যমে আসনগুলো ভাগাভাগি করেছেন তারা। ফলে ১৫৪ আসন ভোট ছাড়াই তারা পেয়ে গেছেন। বিএনপি অংশ নিলে এভাবেই আমাদেরকেও আসন দেয়া হতো।
দুই. বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। জনগণকে আর বিরোধী দলকে ভোট দিতে হলো না। এতে জাতি অভিশাপমুক্ত হয়েছে।
তার কথাতেই পরিস্কার হয়েছে, নির্বাচন নয়, জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে আসন ভাগাভাগির প্রহসনই তিনি চেয়েছেন এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি বিরোধীদল এতে অংশ নিতো তবুও তিনি একই রকম প্রহসনের চেষ্টাই করতেন।
দ্বিতীয়ত: বিরোধীদলহীন নির্বাচনই তাঁর কাম্য। একদলীয় ব্যবস্থাতেই তিনি বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে জনগণ বিরোধী দলকে ভোট দেয়ার কোনো সুযোগ না পায়। এতে তিনি পরিতৃপ্তিবোধ করছেন।
আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই যে, আসন ভাগাভাগি করার আপনি কেউ নন। এটা জনগণের অধিকার। তারাই ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। সেই অধিকার আপনি কেড়ে নিয়েছেন। আমরা সকলেই জানি যে, কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি নয়, জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক এবং সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। তারা একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য, সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দিয়ে পছন্দের প্রার্থীদের তাদের

প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেন। সেই প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার অর্জিত হয়। এটাই গণতন্ত্রের বিধান। এই বিধানের অন্যথা হলে গণতন্ত্র থাকেনা। সেটা হয়ে দাঁড়ায় অবৈধ স্বৈরাচার। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে সেই অবৈধ স্বৈরাচারের পথেই পা দিয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এই পা চোরাবালিতে আটকে যেতে বাধ্য। আমরা পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই, ভোট ও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া ১৫৪ জন এবং কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া বাকী যাদেরকেই আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করবে, তারা কেউই বৈধ জনপ্রতিনিধি হবে না। কেননা, জনগণ তাদেরকে ভোট দিয়ে কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করছে না। কাজেই তাদের সমর্থনে গঠিত সরকার হবে সম্পূর্ণ অবৈধ, অগণতান্ত্রিক ও জনপ্রতিনিধিত্বহীন। তেমন একটি অবৈধ সরকারের আদেশ নির্দেশ মান্য করতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনগণের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকেনা। নৈতিক ও জনসমর্থনের দিক বিবেচনায় নিলে এবং বারবার সংবিধানের বেপরোয়া লঙ্ঘণের কারণে এই সরকার অনেক আগেই দেশ পরিচালনার অধিকার ও বৈধতা হারিয়েছে। তবুও সাংবিধানিক সংকট ও শূণ্যতা চাইনি বলেই এখনো সরকারের কর্তৃত্ব ও অস্তিত্বের প্রতি আমাদের স্বীকৃতি অব্যহত রয়েছে। সংসদ বহাল রেখে নির্বাচনী প্রহসন করতে গিয়ে তারা নজীরবিহীন এক চরম জটিলতা সৃষ্টি করেছে। যে আসন শূণ্য হয়নি, সেখানে নতুন করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্ন অবান্তর। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের এক নিকৃষ্ট নজীর সৃষ্টি করেছে প্রতিটি আসনে এই দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব। এই পরিস্থিতি যারা সৃষ্টি করেছে তাদেরকেই এর নিরসনের দায়িত্ব নিতে হবে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

১৯৭৫ সালে এই আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যা করেছিল। নিজেদের লুন্ঠন ও শাসন-ক্ষমতা পাকাপোক্ত রাখতে সমাজতন্ত্রের নামে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। সব দল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জনগণের সকল মৌলিক ও মানবিক

অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। বিনা ভোটে সরকারের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিল। নির্বাচন ছাড়াই তাদের নেতাকে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করে ঘোষণা করেছিল: 'যেন তিনি নির্বাচিত।' প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের সম্মতি ছাড়াই এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলো তারা গ্রহন করেছিল পার্লামেন্টারী ক্যু'র মাধ্যমে। রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়ন চালিয়ে এবং পেশীশক্তির প্রয়োগে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের সকল প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আজ আবারো আওয়ামী লীগ সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে একটু ভিন্ন আদলে। জনগণের অধিকার হরণকারী চতুর্থ সংশোধনীর মতো এবারের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী তারা একতরফাভাবে ব্রুট মেজরিটির জোরে সংসদে পাস করেছে। এরপর তারা ধাপে ধাপে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে গণতন্ত্র হত্যার পথে। প্রহসন ও কারসাজির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সর্বশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে তারা গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকছে। বর্তমান অবস্থায় প্রাচীন একটি ফরাসী প্রবাদের অনুকরণে আমি আজ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বাক্য উচ্চারণ করতে চাই: 'ডেমোক্রেসি ইজ ডেড, লং লিভ ডেমোক্রেসি।'

সমবেত সাংবাদিকবৃন্দ,
দেশে এখন নির্বাচনের নামে সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ন্যক্কারজনক যে তামাশা চলছে তাতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃটিশ সাময়িকী 'ইকোনমিস্ট' তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছে, 'শাসকেরা জিতবে, হারবে বাংলাদেশ'। শুধু শাসক দল আওয়ামী লীগ জিতলে কথা ছিলনা। যে বিজয়ের অর্থই হচ্ছে দেশের পরাজয়, বাংলাদেশের হেরে যাওয়া, সেটি আমরা মেনে নিতে পারি না। এদেশের জনগণ জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ করে যে-দেশ সৃষ্টি করেছে, তারা সেই দেশের পরাজয় মেনে নেবে না। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এদেশের মানুষ যে গণতন্ত্র এনেছে, সেই গণতন্ত্রকেও তারা কেড়ে নিতে, পরাজিত হতে দিবে না। এদেশের মানুষ তাদের ভোটের অধিকার আদায় করবেই। বাংলাদেশের জনগণ শান্তি, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক তৎপরতার উপযোগী পরিবেশ চান। দীর্ঘ মেয়াদে

যাতে বাংলাদেশ অশান্ত, অনিরাপদ ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ছেয়ে না যায়, তার জন্যই গ্রামে গঞ্জে, শহরে বন্দরে, পাড়ায় মহল্লায় মানুষ আজ লড়াইয়ে নেমেছে। এ লড়াই গণতন্ত্র রক্ষার, অধিকার প্রতিষ্ঠার, জীবন রক্ষার, দেশ বাঁচাবার, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবার। জনগণের বিজয় অর্জন পর্যন্ত এই লড়াই চলতে থাকবে এবং আমরা জনগণের সঙ্গেই থাকবো ইনশাআল্লাহ্।

গণবিচ্ছিন্ন, সন্ত্রাসী, গণহত্যাকারী ও মহালুটেরা সরকার জানতো, তাদের এই কারসাজির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। তাই তারা খুবই সুকৌশলে পরিকল্পিত পন্থায় প্রহসনের নির্বাচনের প্রক্রিয়া এবং মানবতাবিরোধী ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়ের বাস্তবায়নকে একই সময়সীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে। জনগণের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অন্তর্ঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করে, আগুনে ঝলসিয়ে দিয়ে তারা এর দায় বিরোধী দলের ওপর চাপাতে চাইছে। ২০০৬ সালে যারা প্রকাশ্য রাজপথে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করে মৃতদেহের উপর পৈশাচিক উল্লাস করেছে সেই আওয়ামী লীগ আজ মানবতা ও শান্তির বাণী শোনাচ্ছে। অপরদিকে জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে চালাচ্ছে অপপ্রচার। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে সংঘঠিত হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের বিচার আমরাও চাই। তবে বিএনপি বারবার মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে না জড়িয়ে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনগত মানদন্ড বজায় রেখে পরিচালনার পক্ষে অবস্থান ব্যক্ত করেছে। আমাদের পরামর্শ মেনে সরকার যদি বিষয়টিকে নিয়ে অতি-রাজনীতি না করতো, তাহলে আজ দেশে-বিদেশে এ নিয়ে এতো সংশয় সৃষ্টি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হতো না। বাংলাদেশের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, এমনকি জাতিসংঘ পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও মান নিয়ে যে আপত্তি তুলছে, তাতে আমাদের অনেক বেশী সতর্ক ও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ বিষয়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ যে-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, তা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে মর্মাহত করেছে। পাকিস্তানের ভেতরই দায়িত্বশীল মহল থেকে এর প্রতিবাদ করা

হচ্ছে। বিএনপির তরফ থেকে এ বিষয়ে আগেই আমাদের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। আজ আমি আবারো বলছি, ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি। পাকিস্তান এখন সহ¯্র মাইল দূরবর্তী এক পৃথক রাষ্ট্র। ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের সরকারই ত্রিদেশীয় চুক্তি সই করেছিল। সেই চুক্তিতে পাকিস্তানী যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার না করার এবং অতীত তিক্ততা ভুলে সামনে অগ্রসর হবার অঙ্গীকার তারাই করেছিলো। এরপর কোনো ইস্যু নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হলে তা কূটনৈতিকভাবেই নিরসন করা উচিত। কূটনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়ে সরকার এই প্রসঙ্গকে পুঁজি করে দেশের ভেতরে নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। এই রাজনৈতিক খেলা বন্ধ করুন।

সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,
জনগণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছে। আমি বারবার বলেছি, আজ আবারো বলছি, নির্দোষ সাধারণ মানুষের জানমালের যেন কোনো ক্ষতি না হয় সে দিকে সকলের সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। একদিকে হত্যা, নির্যাতন, গুম অপরদিকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অন্তর্ঘাত সৃষ্টির অপকৌশল সরকার নিয়েছে। বিচারপতির বাড়িতে বোমা হামলা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার সময় শাসক দলের লোকেরা ধরা পড়লেও বিচার হচ্ছে না। দোষ দেয়া হচ্ছে বিরোধী দলের ওপর। কাজেই সকলকে খুব বেশি সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। বাংলাদেশের জনগণই আমাদের শক্তির উৎস। তাদের জন্য এবং তাদেরকে নিয়েই আমাদের সংগ্রাম। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের জীবন ও সম্পদের উপর হামলার প্রকাশ্য উস্কানি দিয়েছেন। জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলেই এ ধরনের হামলার মোকাবিলা করতে হবে। সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে গণপ্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হতে দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমি গত ২১ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলনে দেয়া আমার বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করে বলতে চাই কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ হামলার শিকার হলে আগামীতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে অপরাধীদের চিহ্নিত ও শাস্তিবিধান নিশ্চিত করা

হবে। দেশব্যাপী সন্ত্রাস, নাশকতা, হানাহানি উস্কে দিয়ে, অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে সরকার প্রহসনের নির্বাচনকে আড়াল করার যে অপকৌশল নিয়েছে এবং স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়নের নামে তারা তাদের অপশাসন ও নিষ্ঠুর লুন্ঠনকে দীর্ঘায়িত করার যে নীল-নকশা প্রনয়ণ করেছে, তা ব্যর্থ করে দিতে হবে জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। দেশে আজ ভয়ংকর অনিশ্চিত এক নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে সরকার। বিরোধী দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষকে রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। এখন শুরু হয়েছে ঘরে ঢুকে হত্যা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যৌথবাহিনী গঠন করে তাদেরকে চরমভাবে অপব্যবহার করছে সরকার। তালিকা করে বেছে বেছে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা, গ্রেফতার, অপহরণ, নির্যাতন করা হচ্ছে। জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বেআইনী ও নৃশংস অভিযানে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নিয়োজিত করার অপচেষ্টাও শুরু হয়েছে। পিলখানা হত্যাযজ্ঞ ও শাপলা চত্বরে রক্তপাতের খলনায়কেরা দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে দেশবাসীর মুখোমুখি দাঁড় করাবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণের সম্পদ দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে প্রহসনের নির্বাচনে জড়িত করে বিতর্কিত না করার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারের নির্দেশে যৌথবাহিনীর অভিযানে শাসকদলের সশস্ত্র ক্যাডাররাও অংশ নিচ্ছে। তারা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও মহিলাদের পর্যন্ত আটক করে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। অনেকের হত্যার পর লাশ গুম করা হচ্ছে। তাদের ঘর-বাড়ি লুটপাট, বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া এবং আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে গুপ্তহত্যা ও গুম করা। এ ধরণের পৈশাচিকতার তুলনা কেবল ভিনদেশী হানাদার বাহিনীর বর্বরতার সঙ্গেই করা চলে। আজ লক্ষীপুর, মেহেরপুর, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, বগুড়া, জয়পুরহাট, সীতাকুন্ড, বাগেরহাট, সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের তান্ডব। প্রধানমন্ত্রী ও শাসক দলের প্রকাশ্য হুমকির পর তা' আরো বিস্তৃত ও নৃশংস হয়ে উঠেছে। এর দায়-দায়িত্ব উস্কানি ও নির্দেশদাতা সরকার ও নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে। আমি আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘণ করে দেশের নাগরিকদের ওপর এই নির্মম

দমন-অভিযানের প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন বন্ধে সকলকে সোচ্চার হবার এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের বিরাজমান সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ও নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি জাতিসংঘকে আবারো ধন্যবাদ জানাই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, সংসদ, রাজনৈতিক দল, বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, সংবাদ মাধ্যম, মানবাধিকার সংস্থা সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অধিকার সুরক্ষায় যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, তার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শান্তি-স্থিতি, আইনের শাসন ও জনগণের অধিকার রক্ষায় তারা আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবেন এবং পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার জনগণের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াবেন। দেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. মুহম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক নারীর ক্ষমতায়ন ও ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলনের মাধ্যমে দারিদ্রমোচনের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিকে রক্ষার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। আমি এই আন্দোলনকেও জনগণের অধিকার রক্ষার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ বলেই মনে করি। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল প্রহসনের নির্বাচনকে বর্জন করে মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে আজ অটল ভূমিকা পালন করছে। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সকলের প্রতি আমার আহবান, নিজ নিজ রাজনৈতিক বিশ্বাস, কর্মসূচি ও আদর্শ অক্ষুন্ন রেখেই আসুন, দেশ বাঁচাতে, মানুষ বাঁচাতে, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষায়, বহুদলীয় গণতন্ত্র থেকে একদলীয় স্বৈরশাসনের দিকে যাত্রাকে রুখে দিতে আমরা এক হয়ে লড়াই করি। এই সংগ্রামে বিজয়ের পর আমরা সকলে মিলে গড়ে তুলবো অখন্ড জাতীয় সত্বা। দূর করবো হানাহানির অন্ধকার। কায়েম করবো সুশাসন। ফিরিয়ে আনবো আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার। সমঝোতার ভিত্তিতে প্রধান জাতীয় সমস্যা ও বিরোধীয় ইস্যুগুলোর নিষ্পত্তি করবো। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করবো। বাংলাদেশকে উৎপাদন ও কর্মমুখর করে সামনের দিকে এগিয়ে নেবো। দেশের সিভিল সমাজ ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার

সংগঠনকে আমি ধন্যবাদ জানাই শান্তি, সমঝোতা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে সোচ্চার হবার জন্য। আমি সাংবাদিক বন্ধুদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। গণমাধ্যম আজ শৃঙ্খলিত ও রাষ্ট্রীয় ভীতির শিকার। এর মধ্যেও আপনারা সাহস করে অনেক সত্য তুলে ধরছেন। দেশবাসী সংবাদ-মাধ্যম থেকেই জানতে পেরেছেন কী সীমাহীন লুন্ঠন ও দুর্নীতি করে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী-এমপি ও তাদের নিকটজনেরা অঢেল সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। তাদের নিজেদের দেয়া হিসেব থেকেই জানা গেছে যে, গত পাঁচ বছরে তাদের সম্পদের পরিমাণ সোয়া দুই হাজার গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। শেয়ারবাজার ও রাষ্ট্রয়াত্ব ব্যাংকগুলো তারা নির্মমভাবে লুটে নিয়েছে। কারসাজি ও অত্যাচার চালিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার ব্যাপারে তাদের যে উদগ্র বাসনা, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, লুটপাটের এই অবারিত সুযোগ। এ সুযোগ তারা যে কোনো মূল্যে অব্যাহত রাখতে চায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আমি আবারো আহবান জানাচ্ছি, সরকার কিংবা দলবাজ কিছু মুষ্টিমেয় কর্মকর্তার নির্দেশে আপনারা বেআইনি ও অন্যায় কোনো তৎপরতায় লিপ্ত হবেন না। আপনারা বিরোধীদল বা জনগণের প্রতিপক্ষ নন। সরকারি দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল এবং হত্যা, গুম, নির্যাতন চালাবার হাতিয়ার হিসেবে আপনারা ব্যবহৃত হতে পারেন না। মনে রাখবেন, আপনারা সরকারের নন, জনগণের কর্মচারি। এখন সময় এসে গেছে, আপনাদেরকে জনগণের পক্ষেই দাঁড়াতে হবে। এই স্বৈরশাসনের সময় ফুরিয়ে এসেছে। কাজেই তাদের ক্রীড়নক হয়ে নিজ নিজ বাহিনীর সুনাম ও ঐতিহ্য ক্ষুন্নকারী তৎপরতা থেকে আপনারা বিরত থাকবেন, এ আমার আহবান। সরকারকে বলবো, নিজেরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এখন বাংলাদেশকে সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিপদে ফেলবেন না। এই দেশ, এ দেশের মানুষ আপনাদেরকে অনেক দিয়েছে। তাদের প্রতি প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে দেশটাকে ধ্বংস করে ফেলবেন না। অনমনীয়তা ও হঠকারিতা পরিহার করে বাস্তবের দিকে ফিরে তাকান। প্রধানমন্ত্রী এখনো প্রহসনের নির্বাচন করার ব্যাপারে অনড়। তিনি বলেছেন, দশম সংসদ নিয়ে কোনো আলোচনা নয়। পরে একাদশ সংসদ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এটা যুক্তির নয়, জেদের কথা। এটা

বাস্তবসম্মত নয়, অপকৌশলের কথা। আমি তাকে অনুরোধ করি, একগুঁয়েমি পরিহার করুন। গণতান্ত্রিক রাজনীতি হচ্ছে 'আর্ট অব কমপ্রোমাইজ'। সমঝোতা স্থাপন করলে কেউ ছোট হয়ে যায়না। ১৯৯৬ সালে আমরা আপনাদের দাবি মেনে নিয়ে সমঝোতা স্থাপন করেছিলাম। এখন আপনারা ক্ষমতায় আছেন। জনগণের দাবি মেনে নিয়ে সমঝোতায় আসুন। এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। প্রহসনের নির্বাচনের তফসিল বাতিল করুন। আলোচনা শুরু করুন। আমরাও আলোচনায় বসতে রাজি আছি। জনগণের অর্থের অপচয় করে ভোটবিহীন, প্রার্থীবিহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন একটা অর্থহীন প্রহসনের নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই। এতে শুধু আপনারাই কলংকিত হবেন না, গণতন্ত্রও ধ্বংস হবে। আওয়ামী লীগের ভেতরে বিবেকবান, গণতন্ত্রমনা ও দেশপ্রেমিক মানুষ যারা আছেন তাদের প্রতিও আমার আহ্বান, এই দেশ এবং এ দেশের মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ, জনগণের প্রত্যাশা ও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে আপনারাও অবস্থান নিন। স্বৈরশাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। জনগণের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করুন। নানা বাধাবিঘœ পেরিয়ে ১৯৯১ সাল থেকে এদেশে গণতান্ত্রিক যে বিধি-ব্যবস্থা চলে আসছিলো, এবার আওয়ামী লীগের হাতে তার অপমৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। এই গণতন্ত্র বিনাশের ক্ষেত্রে দোসর হয়েছে মেরুদন্ডহীন ও আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন। সংবিধানের দোহাই দিয়ে ভোট, ভোটার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এক কারসাজির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী এবং গণতন্ত্রকে পরাজিত ও জনগণের ভোটাধিকার হরণের ঘৃন্য প্রক্রিয়া তারা চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর কথা প্রায়ই বলেন। এবার দেশের মানুষ তার ন্যক্কারজনক প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে। এটা ইলেকশন নয়, সিলেকশন। এখানে জনগণ ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এই নির্বাচন ও এর মাধ্যমে গঠিত সরকার 'বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল' হবে না। এটা হবে : 'বাই দ্য ইলেকশন কমিশন, ফর দ্য আওয়ামী লীগ, অফ দ্য আওয়ামী লীগ'। এই গণবিরোধী প্রক্রিয়া বন্ধ করার সাধ্য না থাকলে ইলেকশন কমিশনের অন্তত: পদত্যাগ করা উচিত। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন,

কমনওয়েলথ ও যুক্তরাষ্ট্র এই প্রহসনে পর্যবেক্ষক না পাঠাবার কথা জানিয়েছে। অন্যরাও জনগণের অধিকার হরণের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবার বদলে গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয়ার ইংগিত দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু দেশে নয়, বিশ্বসমাজও এই নির্বাচনী প্রহসনকে বৈধতা দিতে রাজি নয়। বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং জনগণের ভোটাধিকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই দৃঢ় অবস্থানকে আমি সাধুবাদ জানাই। এই প্রহসন ঘৃনাভরে বর্জনের জন্য আমি বাংলাদেশের নাগরিক ও ভোটারদের প্রতি আহবান জানাই। যে প্রহসনকে সারা দুনিয়ার কেউ বৈধতা দিতে রাজি নয়, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যাতে শামিল হচ্ছে না, সেই প্রক্রিয়ায় জড়িত না হবার জন্যও আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করছি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে এবং শাসক দলের পরিকল্পিত অন্তর্ঘাত ও নাশকতায় যারা জীবন দিয়েছেন, আমি তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করি। তাদের শোকার্ত স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই। যারা নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও পঙ্গু হয়েছেন তাদের প্রতিও জানাচ্ছি গভীর সহানুভূতি। সারা দেশের জনগণ যেভাবে এই আন্দোলনে একাত্ম হয়ে নিভৃত পল্লীতে পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, সে জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের এই আন্দোলন সফল হবেই ইনশাআল্লাহ্। জনগণের বিজয় অনিবার্য।
আমি এখন চলমান আন্দোলনে চার দফা করণীয় ও নীতি-কৌশল তুলে ধরছি:
১। ভোটাধিকার হরণকারী ও মানবাধিকার লঙ্ঘণকারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রাণক্ষয়ী লড়াইয়ে যারা শরিক আছেন এবং হচ্ছেন তাদের মধ্যে সমন্বয়, সমঝোতা ও ঐক্য গড়ে তুলুন।
২। বিভক্তি ও বিভাজনের বিষাক্ত রাজনীতির চিরঅবসান ঘটানোর জন্য জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে মূল্য দিন। জাতীয় ক্ষেত্রে বিতর্কিত বিষয়সমূহ অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ আলোচনা এবং গণভোটের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় মীমাংসার রাজনৈতিক সংকল্পকে জোরদার

করুন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ যা চায় না দেশের সংবিধানে তা থাকতে পারে না।

৩। ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক সংগ্রাম কমিটিগুলোর পাশাপাশি দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনরত সকল পক্ষকে নিয়ে অবিলম্বে জেলা, উপজেলা ও শহরে 'সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনী তামাশা প্রতিহত করুন। প্রতিটি জেলার প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখুন এবং জনগণের জান, মাল ও জীবীকার নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে স্ব স্ব নাগরিক দায়িত্ব পালন করুন।

৪। গণতন্ত্রের এই সংগ্রামে সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী, সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠির মানুষদের যুক্ত করার পাশাপাশি তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লংঘণের সরকারি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখুন, সজাগ থাকুন। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে বরদাশত করবেন না।

এই আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত, ব্যাপক ও পরবর্তী ধাপে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমি আগামী ২৯ ডিসেম্বর রোজ রোববার সারা দেশ থেকে দলমত, শ্রেণী-পেশা, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সক্ষম নাগরিকদেরকে রাজধানী ঢাকা অভিমুখে অভিযাত্রা করার আহবান জানাচ্ছি। এই অভিযাত্রা হবে নির্বাচনী প্রহসনকে 'না' বলতে, গণতন্ত্রকে 'হ্যাঁ' বলতে। এই অভিযাত্রা হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অর্থবহ নির্বাচনের দাবিতে। এই অভিযাত্রা হবে শান্তি, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকারের পক্ষে। এই অভিযাত্রা হবে ঐতিহাসিক। আমরা এই অভিযাত্রার নাম দিয়েছি: 'মার্চ ফর ডেমোক্রেসি', গণতন্ত্রের অভিযাত্রা।

আমার আহবান, বিজয়ের মাসে লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা হাতে সকলেই ঢাকায় আসুন। ঢাকায় এসে সকলে পল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মিলিত হবেন।

আমার আহ্বান এই অভিযাত্রায় ব্যবসায়ীরা আসুন, সিভিল সমাজ আসুন, ছাত্র-যুবকেরাও দলে দলে যোগ দাও।

মা-বোনেরা আসুন, কৃষক-শ্রমিক ভাই-বোনেরা আসুন, কর্মজীবী-পেশাজীবীরা আসুন, আলেমরা আসুন, সব ধর্মের নাগরিকেরা আসুন, পাহাড়ের মানুষেরাও আসুন। যে যেভাবে পারেন, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে,

অন্যান্য যানবাহনে করে ঢাকায় আসুন। রাজধানী অভিমুখী জন ্রাতে শামিল হোন।

একই সঙ্গে যারা রাজধানীতে আছেন, তাদের প্রতিও আমার আহ্বান, আপনারাও সেদিন পথে নামুন। যারা গণতন্ত্র চান, ভোটাধিকার রক্ষা করতে চান, যারা শান্তি চান, যারা গত পাঁচ বছরে নানাভাবে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, শেয়ারবাজারে ফতুর হয়েছেন সকলেই পথে নামুন।

জনতার এ অভিযাত্রায় কোনো বাঁধা না দেয়ার জন্য আমি সরকারকে আহবান জানাচ্ছি। যানবাহন, হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ করবেন না। নির্যাতন, গ্রেফতার, হয়রানির অপচেষ্টা করবেন না। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হবার অধিকার দিয়েছে। সেই সংবিধান রক্ষার শপথ আপনারা নিয়েছেন। কাজেই সংবিধান ও শপথ লঙ্ঘণ করবেন না।

শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনে বাঁধা এলে জনগণ তা মোকাবিলা করবে। পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচি দেয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বলছি, দেশবাসীর এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি সফল করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা আপনারা দেবেন।

এই কর্মসূচির সাফল্যের জন্য আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য কামনা করি।

আজ এ পর্যন্তই। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।